লুচিঃ গল্পের শুরু পাল যুগে

আজকাল নাস্তায় স্থান করে নিয়েছে ফাস্টফুডসহ পশ্চিমা সব খাবার দাবার। সেসবের দাপটে অনেক খাবার স্থান ছেড়ে দিলেও নিজের দখল বজায় রেখেছে লুচি। ময়দায় তৈরি লুচির সঙ্গে বাঙালির আবেগ জড়িত। তবে কেউ কি কখনও ভেবেছি, কবে কিভাবে কোথা থেকে লুচির উৎপত্তি। কিংবা এর নামকরণ হলো কিভাবে।

হাসান নীল

নামকরণ

লুচির উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে গেলে যেমন অতীতে যেতে হয়, নামকরণের বেলায়ও তাই। অনেকের মতে হিন্দি শব্দ লুচ থেকে এসেছে লুচি নামটি। লুচ অর্থ পিচ্ছিল। ঘিয়ে ভাজা লুচি হাতে নিলে পিছলে যায়। তবে গল্পটি সবাই যে মেনে নিয়েছেন তা কিন্তু নয়। অনেকে প্রকাশ করেছেন দ্বিমত। তারা মনে করেন এর সঙ্গে রয়েছে সংস্কৃত যোগ। লুচির আকৃতি অনেকটা চোখের মণির মতো। অন্যদিকে চোখের মণিকে সংস্কৃতিতে বলা হয় লোচক। এই লোচক থেকেই খাবারটির নাম হয় লুচি। এর বাইরে নামকরণ নিয়ে আর কোনো তথ্য সামনে আসেনি। তাই টিকে আছে দুই গল্পই। কেউ এটা বিশ্বাস করেন তো কেউ ওটা।

গল্পের শুরু

লুচির উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে গেলে পেছনে ফিরে যেতে হবে। সে একাদশ শতকের কথা। সেসময় চক্রপানি দত্ত নামে এক চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ছিলেন পাল যুগের বিখ্যাত চিকিৎসক। বেশ কিছু বইও লিখেছেন। এরমধ্যে একটি 'দ্রব্য গুণ'। এই বইয়ে লুচির বর্ণনা দিয়েছেন চক্রপানি। সংস্কৃতি ভাষায় লেখা বইটিতে লুচি নিয়ে চক্রপানি লিখেছেন 'সুমিতায়া ঘৃতাক্তায়া লোপ্ত্রীং কৃত্বা চ বেল্লয়েৎ। আজ্যে তাং ভর্জয়েৎ সিদ্ধাং শষ্কুলী ফেনিকা গুণাঃ॥' অর্থাৎ 'গম চূর্ণকে ঘি দিয়ে মেখে, লেচি করে বেলে, গরম ঘিয়ে ভেজে তৈরি হয় শষ্কুলী, যার গুণ ফেনিকার মতো।' চক্রপানির লেখায় উঠে আসা শষ্কুলীই হচ্ছে লুচি। এটি মূলত লুচির আদি রূপ।

প্রকার ভেদ

কয়েকটি রূপ অর্থাৎ প্রকার রয়েছে লুচির। এগুলো হচ্ছে খাস্তা, সাপ্তা ও পুরি। প্রথমে কথা বলব খাস্তা নিয়ে। এই লুচি তৈরি করা হতো বেশি ময়ান দিয়ে। ময়ান ছাড়া ময়দা দিয়ে তৈরি করা লুচির নাম সাপ্তা। অন্যদিকে পুরির মধ্যে ময়দা থাকে না। এটি ময়দার পরিবর্তে আটা দিয়ে তৈরি করা হয়। তবে আটা দিয়ে তৈরি নয় বরং আজও ধবধবে সাদা ময়দার লুচিই সবার প্রিয়। পুরি ঘরের খাবার টেবিল দখল করতে না পারলেও বাজারে কিন্তু তারই রাজত্ব। কেননা ভাজাপোড়ার দোকানগুলোতে অন্য খাবারের চেয়ে আটা দিয়ে বানানো লুচি তথা পুরির চাহিদা তুলনামূলক বেশি।

ভৌগোলিক অবস্থান

লুচি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তবে তা নির্ভর করে ভৌগোলিক অবস্থানের ওপরও। সাহিত্যিক মনিশঙ্কর মুখার্জির মতে কলকাতা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের লুচি আকারে বড়। কলকাতার সঙ্গে দূরত্ব কমার সঙ্গে আকৃতি ছোট হতে থাকে। এর যথেষ্ট উদাহরণও রয়েছে। দিনাজপুরের লুচির কথা বলা যায়। জেলাটির কান্তনগর থানা মন্দিরের লুচি ছিল একেকটা থালার সমান। দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে খেতে হতো। ভক্তরা ডাল দই ক্ষীর মাখিয়ে পরম ভক্তিভরে খেতেন। অন্যদিকে মালদহ জেলার লুচিও ছিল প্লেটের সমান। হাতিপায়া লুচি বলা হতো সাদুল্লাপুর শ্মশান অঞ্চলের লুচিকে। এগুলো একেকটা হাতির পায়ের সমান আকৃতি বিশিষ্ট ছিল। এই লুচি ওজন করে বিক্রি করা হতো। মকর সংক্রান্তির সময় এই লুচি খাওয়ার ভিড় লাগে। সে সময় পূণ্যার্থীরা ভগীরথীর জলে স্নান করে হাতিপায়া লুচি তৃপ্তি সহকারে খেতেন। তবে কলকাতা শহরের লুচি আকারে ছোট হলেও সবচেয়ে ক্ষুদ্র লুচির সন্ধান পাওয়া গেছে মেদিনীপুর জেলার রাধামোহনপুর স্টেশনের কাছে পলাশী গ্রামে। নন্দী পরিবারের ঠাকুরবাড়ির ভোগে নিবেদিত লুচির ব্যাস এক থেকে দেড় ইঞ্চি। গবেষক প্রণব রায়ের মতে এটি সম্ভবত ভারতের ক্ষুদ্রতম লুচি। অন্যদিকে কলকাতার লুচি তিন থেকে ৪ ইঞ্চি হয়ে থাকি। গ্রামাঞ্চলের লুচি হয় ৮ থেকে ১২ ইঞ্চি। তাল দিয়েও লুচি বানানো হয়। তবে বিশেষ উৎসবে। ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী। ওই সময়টায় বাঙালি হিন্দু বাড়িতে তালের বিভিন্ন পদ রান্না করা হয়। এর মধ্যে লুচিও থাকে।

বেশি খেলে ক্ষতি

স্বাদে অতুলনীয় লুচির চাহিদা প্রত্যেক বাঙালির কাছে রয়েছে। অনেকের কাছে তা বেশিই প্রিয়। পাতে দিলে দিন দুনিয়া ভুলে খেতে থাকেন। এখানেই বিপত্তি। লুচি খাওয়ার সময় কিছু নিয়ম মানা উচিত। বাইরের লুচির পরিবর্তে বাড়িতে বানানো লুচি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আর তাই ঘরের লুচিই শ্রেয়। এছাড়া পুষ্টিগুণ আটার লুচিতে বেশি থাকে। ময়দা হচ্ছে প্রক্রিয়াজাত শর্করা। তাই পুষ্টির কথা মাথায় রাখলে আটার লুচি খাওয়াটাই শ্রেয়। তেলের দিকেও নজর দিতে হবে। এমন তেলে লুচি ভাজা উচিত যাতে 'স্মোকিং পয়েন্ট' বেশি থাকে। এরমধ্যে রয়েছে ক্যানোলা, সরিষা, উদ্ভিজ, প্রক্রিয়াজাত তেল। এগুলোতে স্মোকিং পয়েন্ট বেশি থাকে। পুষ্টিগুণের কথা বিবেচনা করে এসব তেলে লুচি ভাজা উচিত। পোড়া তেলেও লুচি ভাজা যাবে না। কেননা এই তেল শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তাই খেয়াল রাখতে হবে লুচি ভাজার সময় তেল যেন পুড়ে না যায় আর পুড়ে গেলে পাল্টে নিতে হবে। হৃদযন্ত্রের অসুখ রয়েছে যাদের তাদেরও লুচি খাওয়ার আগে একটু ভেবে নেওয়া উচিত। লুচি খান। অবশ্যই খান। তবে পরিমিত।

বাংলা সাহিত্যে

একটি জাতির জীবনঘনিষ্ঠ যেকোনো কিছুর প্রভাব সাহিত্যের ওপর পড়ে। লুচিও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা সাহিত্যে লুচির ব্যবহার দেখেই বোঝা যায় এটি বাঙালির জীবনে কতটা জনপ্রিয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, প্রমথ চৌধুরীর থেকে শুরু করে অধিকাংশ সাহিত্যিকের লেখাই উঠে এসেছে লুচির কথা।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে লুচি ভাজার বর্ণনা পড়ে জিভে জল এসে যায়। মনে হয় চোখের সামনেই ডুবো তেলে ফুটন্ত উনুনে ভাজা হচ্ছে মুখরোচক এ পদটি। হাজারি ঠাকুরের লুচিভাজার অনবদ্য বর্ণনায় তিনি লিখেছেন, 'তারপর একঘণ্টা হাজারি অন্য কিছু ভাবে নাই, কিছু দেখে নাই। দেখিয়াছে শুধু লুচির কড়া, ফুটন্ত ঘি, ময়দার তাল আর বাখারির সরু আগায় ভাজিয়া তোলা রাঙা রাঙা লুচির গোছা। তাহা হইতে গরম ঘি ঝরিয়া পড়িতেছে'।

অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের লেখনিতে বাঙালির খাবার-দাবারসহ আচার অভ্যাস উঠে এসেছে। লুচির কথা তিনি বলেছেন বারবার। পল্লী সমাজে লিখেছেন, 'রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে পংক্তিভোজনে খাইয়ে দাইয়ে সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল ষোলখানা লুচি, চারজোড়া সন্দেশ'।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল দাওয়াত খাওয়ানোর বাতিক। শীতকালে বন্ধুদের দাওয়াত দিতেন পদ্য লেখা চিঠি দিয়ে। একবার তিনি লিখেছিলেন, 'ফুলকো লুচি ভাজা কপি/ মাংস থাবা থাবা/ খাবে যদি, পদ্মপুকুর/ দৌড়ে এস বাবা।'

এদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের উইলে কমলাকান্তকে লুচি নিয়ে বলতে শুনে মনে হয় লেখক যেন নিজের মনের কথাটি কমলাকান্তকে দিয়ে বলিয়েছেন। সেখানে লেখা, 'যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানে আমার মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহা বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি'। এছাড়া জনক গীতিকারের গানে উঠে এসেছে, 'লুচির কোলে পড়ল চিনি, যেন শ্যামের কোলে সৌদামিনী।' এছাড়া 'দেখবি আর জ্বলবি, লুচির মতো ফুলবি'! ছন্দটি অনেকের মুখে মুখে ঘোরে।